গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৬ সংখ্যা ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

১ মার্চ থেকে

বাড়তি বিদ্যুৎ বিল বয়কট করুন

এস ইউ সি আই-এর ডাকে ২৭ জানুয়ারির ঐতিহাসিক বাংলা বন্‌ধ সফল হয়েছে জনগণ উদ্যোগী হয়েছিলেন বলেই। বন্‌ধ ভাঙার জন্য ভয়-হুমকি দেওয়া হয়েছে, সরকার ট্রেন-বাস-ট্রাম বেশি সংখ্যায় চালিয়েছে, কিন্তু জনগণ তাতে ওঠেননি। ফলে সরকার ব্যর্থ হয়েছে, বন্‌ধ সফল হয়েছে। জনগণের এই অভূতপূর্ব সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে শঙ্কিত রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ মাশুল নিয়ে হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের কথা বলে এখন বিভ্রান্ত করতে চাইছে। বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুলের বোঝাকে রুখতে হলে এবার বর্ধিত বিল বয়কট আন্দোলন করতে হবে। শুধু এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের দ্বারা একাজ সম্ভব নয়। তারা আন্দোলনের সৈনিক হিসাবে থাকবে, কিন্তু শুধু তার দ্বারা বিল বয়কট আন্দোলন সফল হবে না। এজন্য গ্রাহক জনগণকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে, গণকমিটি গঠন করে 'বর্ধিত বিল দেবনা' এই দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বিল বয়কট করতে হবে। দু'এক মাস বিল জমা না পড়লেই গোয়েঙ্কা গোষ্ঠী ও সরকার কেঁপে যাবে, জনমতের প্রতি সম্মান দেখাতে বাধ্য হবে।

কেন বিল বয়কট করবেন ?

- বিদ্যুৎ আইনের কোথাও 'পারস্পরিক ভরতুকি' কথাটার কোন উল্লেখই নেই। কমিশন, সরকার বা CESC কেউ প্রমাণ করেনি কোথায় কতটা 'পারস্পরিক ভরতুকি' রয়েছে।
- বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ২৯(৩) ধারায় পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, লোড ফ্যাক্টর, পাওয়ার ফ্যাক্টর, বিদ্যুৎ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দামের পার্থক্য থাকবে। এই পার্থক্যকেই কমিশন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার পারস্পরিক ভরতুকি বলে প্রচার করছে।
- ২৯(৩) ধারাকে অমান্য করে অভিন্ন মাশুল ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সমস্ত গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম প্রতি ইউনিট ৩.৯০ টাকা হয়ে যাচ্ছে।
- এর ফলে CESC-র ১৮ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে ১৭ লক্ষেরও বেশি গ্রাহক গরিব-মধ্যবিত্ত-গৃহস্থ, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ফেব্রুয়ারি মাসের বিলে দাম বাড়বে অস্বাভাবিক হারে। অপরদিকে বহুজাতিক সংস্থা এবং দেশীয় পুঁজিপতিদের বিদ্যুতের দাম অনেকটা কমে যাবে। অর্থাৎ জনসাধারণের বর্ধিত মাশুলের টাকা দিয়ে দেশি-বিদেশি ধনীদের ভরতুকি দেওয়া হবে।
- জনসাধারণের বিদ্যুৎ বিলে ফেব্রুয়ারিতে দাম নির্ধারণ হবে প্রতি ইউনিটে ৩.৯০ + সরকারি বেআইনি বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ ২৫ পয়সা + আনুপাতিক হারে সরকারি ডিউটি।
- এপ্রিল মাসে হবে ৩.৯০ টাকা ইউনিট + বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ ২৫ পয়সা ইউনিট + আনুপাতিক হারে সরকারি ডিউটি + ৩৪ মাসের বকেয়ার ২৪ ভাগের ১ ভাগ।
- CESC কমিশনের কাছে পুনরায় ২০০২-০৩ সাল এবং ২০০৩-০৪ সালের জন্য যথাক্রমে ১০.৫% এবং ১৩.৩৩% মাশুল বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে। এর রায় ঘোষণার পর আপনার ইউনিট প্রতি দাম এবং বকেয়া আরো বৃদ্ধি পাবে।
- রাজ্য সরকার বহুজাতিক সংস্থা ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একমত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

দুয়ের পাতায় দেখুন

পার্টির নেতা ও কর্মীদের প্রতি

কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

[সফল বা)লা বন্‌ধ ও পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচির উপর এস ইউ সি আই রাজ্য কমিটির আহ্বানে ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে একটি কর্মীসভা হয়। ঐ কর্মীসভায় আমাদের প্রিয় নেতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর যে লিখিত বার্তাটি পাঠ করে শোনানো হয়, সেটি নিম্নে দেওয়া হল।]

কমরেডস্,

২৭শে জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধ্ পশ্চিমবাংলার গণ আন্দোলনের এতদিনের ইতিহাসে এমন একটি ঘটনা যার একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য আছে। এই বন্‌ধ তাই মানুষ বহুদিন মনে রাখবেন।

জনজীবনের সব থেকে জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে সঠিক সময়ে এই বন্‌ধের ডাক দেওয়াটা নিঃসন্দেহে নেতৃত্বের সময়োচিত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু শুধু সঠিক সিদ্ধান্তই এই সাফল্য এনে দেয়নি। এই সাফল্য এসেছে প্রধানত দলের হাজার হাজার একনিষ্ঠ কর্মীর অক্লান্ত এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য। যারা তীব্র শীতের মধ্যেও দিনের পর দিন রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে দলের আবেদন নিয়ে গেছেন এবং শেষ পর্যন্ত বন্‌ধের পক্ষে একটা অত্যন্ত ব্যাপক ও শক্তিশালী জনমত গড়ে তুলতে পেরেছেন। অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চল ও মফঃস্বল থেকে শুরু করে শহরের বস্তিতে এবং পাড়ায় পাড়ায় ক্ষেতমজুর, গরিব চাষি থেকে শুরু করে শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, যুবক, দোকানদার নির্বিশেষে খেটে খাওয়া মানুষও বন্‌ধকে আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছেন, এমনকি বহু ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশও নিয়েছেন। ফলে, শাসক ও বিরোধী দলগুলোর এবং সুচতুর বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমের সম্মিলিত বিরোধিতা সত্ত্বেও ২৭ জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধ সফল হয়েছে।

আজ পর্যন্ত আমরা যতগুলো বন্‌ধ করেছি তার মধ্যে ২৭ জানুয়ারির এই বন্‌ধ ব্যাপ্তি ও গভীরতার দিক থেকে অন্য সবগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এবং আমার নিজের তরফে আমি পশ্চিমবাংলার জনসাধারণকে এবং দলের সমস্ত কর্মীকে এর জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সাফল্যকে অবিলম্বে সংহত করা দরকার। তার জন্য যেটা সকলের আগে করা দরকার, তা হল, বন্‌ধের প্রস্তুতি থেকে আজ পর্যন্ত ব্যক্তিগত ও

দুয়ের পাতায় দেখুন

ধানতলার বীভৎস ঘটনা ঃ রাজ্যের থানাগুলিতে এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

১০ ফেব্রুয়ারি ভবানীপুর থানায় বিক্ষোভ

১০ ফেব্রুয়ারি শ্যামপুকুর থানায় বিক্ষোভ

কমরেড নীহার মুখার্জীর আহ্বান

একের পাতার পর

দলগতভাবে আমাদের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা ঘটেছে, কোথায় কতটুকু লাভবান হয়েছি, আমাদের প্রতি জনসমর্থন এবং অন্যান্য দলের কর্মীদের সমর্থনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য কি কি ছিল এগুলোর ওপর জেলাভিত্তিক রিভিউ মিটিংগুলো যত দ্রুত সম্ভব সেরে ফেলা। কারণ, এটা না করে একটা এক এবং অভিন্ন মূল্যায়ন, উপলব্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে এগোনো যাবে না। এতবড় সাফল্য সত্ত্বেও এবং পূর্ণ সদিচ্ছা থাকলেও, এই ফলকে সংহত করা যাবে না। অতএব, এগুলো নিয়ে সংক্ষেপে কর্মীদের রিপোর্ট করার সুযোগ দিয়ে, জেলা অথবা রাজ্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে দ্রুত জেলাভিত্তিক রিভিউ মিটিং করে সেখানে সুনির্দিষ্ট আশু কর্মসূচি নিতে হবে। এই হল প্রথম পদক্ষেপ।

এই কর্মসূচির ভিত্তিতে গ্রামে-শহরে, পাড়ায় পাড়ায় যাঁরা এই বন্‌ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন, তা যতটুকুই হোক, কিংবা নৈতিক সমর্থনও দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে দ্রুত সংযোগ স্থাপন করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে তাঁদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং যে উন্নত সর্বহারা সংস্কৃতির আধারে আমরা গণ আন্দোলনগুলোকে একটা ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গড়ে তোলার চেষ্টা করছি তার দ্বারা তাঁদেরও আকৃষ্ট করার জন্য বিরামহীন চেষ্টা করে যেতে হবে। এবং তার জন্য তাঁদের মধ্যে পড়ে থাকতে হবে। তাঁদের ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে, তাঁদের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোর প্রতিকারের জন্য তাঁদের নিয়েই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য লেগে থাকতে হবে। এইভাবে মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে প্রত্যক্ষ এবং সুগভীর সম্পর্ক, বা নাড়ীর সংযোগ। কিন্তু, বলা বাহুল্য, ধরা বাঁধা গৎ-এ, শুধু প্রোগ্রামমাফিক যাওয়া আসার দ্বারা কখনই এই সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় না। একাও কেউ এটা পারেন না। অতএব, সেল, লোকাল কমিটি এবং জেলা কমিটি স্তর পর্যন্ত এর উপযুক্ত কর্মরীতি নিতে হবে। তার জন্য তেমন সাংগঠনিক পদক্ষেপ নিতে হবে, পুরোনো অনুপযুক্ত রীতি পাল্টাতে হবে। আর খেয়াল রাখতে হবে যে, কর্মীদের উপযুক্ত মানসিক বিকাশও একই সঙ্গে ঘটাতে না পারলে হবে না। এই দুটি দিক — অর্থাৎ আদর্শগত এবং সাংগঠনিক দিককে সুষ্ঠুভাবে বিবেচনায় নিয়েই রিভিউ মিটিং-এ আশু কর্মসূচি স্থির হবে।

অন্যদিকে, কর্মীদের এই কথাটা মানুষকে বোঝাতেই হবে যে তাদের সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই একের পর এক যে আন্দোলনগুলো গড়ে তোলার চেষ্টা করছে, তাদের নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সেগুলো সত্যিকারের অর্থে গড়ে তোলাই যায় না। এ তাদেরই আন্দোলন। আমাদের দল আন্দোলনের পরিকল্পনা করতে পারে, উদ্যোগ নিতে পারে, শুরুও করতে পারে — কিন্তু পুরোটা করে দিতে পারে না। তাই জনসাধারণকে পথে নামতেই হবে। তা না হলে, আন্দোলনের প্রতি অবিশ্বাস, অনীহা এবং অশ্রদ্ধা সৃষ্টি করে তাদেরকে বিপ্লবী রাজনীতি ও আন্দোলন থেকে সরিয়ে রাখার জন্য বুর্জোয়া দলগুলো এবং সংবাদমাধ্যমের প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তকেই সাহায্য করে দেওয়া হবে।

এছাড়া, আন্দোলনমুখী এই মনটা তৈরির চেষ্টার সাথে সাথেই তাদের দেখানো দরকার, বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার থেকেই এই সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি, যেগুলো এই ব্যবস্থাটা টিকে থাকলে শুধু বাড়তেই থাকবে, আর সেজন্যই সমস্ত আন্দোলনগুলোকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করে গড়ে তোলা চাই। তারই জন্য চাই আন্দোলন চলার সময় স্তরে স্তরে গণসংগ্রাম কমিটি এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলার কার্যক্রম। কারণ, একদিন এই কমিটিগুলোই জনগণের বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির জন্ম দেবে — বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবে। এই উপলব্ধি এবং স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, ভোটসর্বস্ব বুর্জোয়া ও মেকি মার্ক্সবাদী রাজনীতিকে প্রতি পদে উদ্‌ঘাটিত করে করে আপনাদের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের রাস্তা তৈরি করতে হবে। এই আন্দোলনে হয়তো অনেক সময় দাবিও আদায় হবে। আর দাবি আদায় হোক বা না হোক — শোষণমুক্তির এক নতুন দিগন্ত শেষ পর্যন্ত উন্মোচিত হবে।

আমাদের দল — যেটা একক শক্তিতে এই আন্দোলনগুলো করে চলেছে এবং ২৭ জানুয়ারির সফল বন্‌ধ করেছে — সেটা কমরেড শিবদাস ঘোষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রমিকশ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল। দর্শন, রাজনীতি, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, জীবনের সমস্ত বিষয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা অন্য সমস্ত দলের থেকে মৌলিকভাবে আলাদা। বুদ্ধিতে এবং সংস্কৃতিতে সামগ্রিকভাবে জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করাই বিপ্লবী কর্মক্ষমতা বাড়ার গ্যারান্টি। এরই ওপর আন্দোলনের সংহতি, অগ্রগতি ও সাফল্য নির্ভর করছে। এই কথাটা আপনারা মনে রাখবেন।

আপনাদের কাছে এই আমার আহ্বান এবং আমি জানি আপনারা এতে সাড়া দেবেন।

ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

কমরেড শিবদাস ঘোষ

লাল সেলাম।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার এস ইউ সি আই দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড শশীমোহন রায় দীর্ঘ রোগভোগের পর গত ৭ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যেই শুধু নয় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যেও শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর খবর পেয়েই একে একে কর্মী সমর্থকরা তাঁর বাড়িতে সমবেত হন। জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিকও যান। শেষ যাত্রা কমরেড রায়ের বাড়ি থেকে শ্মশানঘাটে পৌঁছলে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত শোক অনুষ্ঠানে কমরেড শশীমোহন রায়ের মরদেহে রক্তপতাকা দিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন কমরেড তপন ভৌমিক। বিভিন্ন গণসংগঠন, দলের কর্মীরা ও উপস্থিত জনগণ পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর শেষকৃত্য সমাপন হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জে যখন দলের কাজ শুরু হয় সেই সময় কমরেড শশীমোহন রায় কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত 'চাষী আন্দোলন প্রসঙ্গে' বইটি পড়ে দলের প্রতি আকৃষ্ট হন ও সোস্যালিস্ট পার্টি ছেড়ে এস ইউ সি আই দলে যোগদান করেন। সেইদিন থেকে জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে জীবনে অনুসরণ করার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর সহজ সরল স্বভাব, মধুর ব্যবহার ও বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি গভীর আনুগত্য তাঁকে দলের কর্মী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এমনকি বিরুদ্ধ দলের কর্মীদেরও ভালবাসার পাত্র করেছিল।

গত ১৮ জানুয়ারি রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে কমরেড শশীমোহন রায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় জেলা সম্পাদক কমরেড তপন ভৌমিক বলেন — "কমরেড শশীমোহন রায় একা একা দলের কাজ শুরু করেন। বহুদিন তিনি এই অঞ্চলে একাই কাজ করেছেন। তাঁকে দলের পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য বিরুদ্ধ দলের চক্রান্তে তাঁর বাড়িতে ৬ বার ডাকাতি হয় ও তিনি সর্বস্বান্ত হন। তবুও তিনি দল পরিত্যাগ করেননি। অবিচল নিষ্ঠায় আজীবন কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর এই নিষ্ঠা আমাদের অনুপ্রেরণা দেয়।" এছাড়াও সভায় বক্তব্য রাখেন রাজগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ বর্মন, তীরেশ রায় প্রমুখ।

কমরেড শশীমোহন রায় লাল সেলাম

কেন বিল বয়কট করবেন ?

একের পাতার পর

আইন ১৯৯৮ চালু করেছে। এই আইন চালু করা রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক নয়। এখনও বহু রাজ্যে চালু হয়নি।

* রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সাথে হাত মিলিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কেসে অংশ না নিয়ে সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গেই প্রথম এই অভিন্ন মাশুল নীতি কার্যকরী হতে দিয়েছে।
* বর্তমানে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য রাজ্য সরকার হাইকোর্টে মামলা করেছে। কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা থাকলে এখনই ১৯৯৮ সালের আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের রায় বাতিল করতে পারে।
* CESC সরকারি ডিউটির টাকা জমা দিচ্ছে না। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৯৯৬ কোটি টাকা দেয়নি, কিন্তু সরকার নীরব।
* বিদ্যুৎ চুরির অভিযোগ এনে CESC-র Loss control সেল 'বিদ্যুৎ আইন পশ্চিমবঙ্গ সংশোধনী ২০০১' অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করে কোটি কোটি টাকা লুণ্ঠন করছে, কিন্তু তার হিসাব নেই। হিসাব দেখানো হয়েছে বিদ্যুৎ চুরি ধরতে CESC-র খরচ বেড়ে গিয়েছে।
* সরকারের সাহায্যে CESC আইন পাল্টে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা অতিরিক্ত সিকিউরিটি মানি আদায় করছে। প্রতি বছর এই টাকা আদায় করবে। আপনি কোন দিন এই টাকা ফেরৎ পাবেন না। এই টাকার কোন হিসাব নেই।

তাই নিম্নলিখিত দাবিতে বিদ্যুৎ বিল বয়কট করুন

১। অবিলম্বে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকারকে কমিশনের অভিন্ন মাশুল বাতিল করতে হবে।

২। গরিব-মধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে বহুজাতিক সংস্থা ও দেশিয় ধনীদের ভরতুকি দেওয়া চলবে না।

৩। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের নীতি পাল্টাতে হবে। নতুবা কমিশন বাতিল করতে হবে।

৪। প্রতি বছর বিদ্যুতের দাম বাড়ানো চলবে না।

জেনে রাখুন ঃ **গ্রিন বিলের 'ডিউ ডেট পার না হলে লাইন কাটা যায় না**

বিদ্যুতের মাশুল যা ছিল এবং যা হবে

গৃহস্থ ১০০ ইউনিটের বিলের একটি মডেল দেওয়া হল

৭ই নভেম্বর ২০০১ কমিশনের রায় অনুযায়ী ছিল (টাকায়)	কমিশন ঘোষিত বর্তমান অভিন্ন মাসুলের ভিত্তিতে হবে (টাকায়)
২৫১.৪১	ফেব্রুয়ারিতে দিতে হবে — ৪৭৮.২৫ এপ্রিল থেকে দিতে হবে — ৬৭৩.৩৭ মে মাসে আরো বেশি

ধানতলা ঃ এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ধানতলা থানার আইসমালির ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা সহ নানা দাবির ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

‘সময়’ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চা-মালিকরা

গড়ে তুলুন প্রতিরোধ

চা-শিল্পে নিযুক্ত কয়েক লক্ষ শ্রমিক আজ ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন। এই শিল্পে নিয়োজিত প্রায় ৩ লক্ষ স্থায়ী শ্রমিক এবং অগণিত অস্থায়ী মজুর নিয়ে কয়েক লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ। তাদের একটি বড় অংশ কাজ হারিয়ে অনাহারে প্রাণ হারাচ্ছেন, অর্ধাহারে মৃত্যুর মুখোমুখি এবং অসুস্থ হয়ে অসহায়ভাবে সময় গুণছেন। জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের ১৫৩টি, তরাই অঞ্চলের ৪৬টি এবং দার্জিলিং পাহাড়ের ৭৬টি বাগান ধরলে উত্তরবঙ্গে মোট প্রতিষ্ঠিত (set) বাগানের সংখ্যা ২৭৫টি। এছাড়া রয়েছে কয়েক হাজার সদ্য-গজানো ছোট ছোট চা-বাগান যেখানে চা-পাতা প্রক্রিয়াজাত করবার কারখানা নেই, শুধু চা-পাতা তুলে তারা অন্য কারখানায় বিক্রি করে দেয়। প্রতিষ্ঠিত (set) বাগানগুলি সরকারের কাছ থেকে ‘লিজ’ নেওয়া জমিতে গড়ে উঠেছে আর সদ্য-গজানো চা-বাগানগুলি গড়ে উঠেছে হস্তান্তরিত কৃষি-জমিতে। ইতিমধ্যে ২৫টি চা-বাগান বন্ধ হয়ে গিয়েছে, এবং এই পথ ধরে আরো বাগানে তালা লাগাবার চেষ্টা চলছে। মালিকরা রাতের অন্ধকারে বাগান ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, যাওয়ার আগে সাপ্তাহিক রেশন, জল-আলো সরবরাহ ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ আইন অনুযায়ী বাগান বন্ধের নোটিশ দিলেও এসব সুযোগ অব্যাহত রাখতে মালিক বাধ্য থাকে। তাই শ্রমিকদের জীবনে নেমে এসেছে চরম সঙ্কট। ইতিমধ্যে বহু মৃত্যুর কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে — কিন্তু তরাই-ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অপ্রকাশিত রয়ে গিয়েছে আরো বেশি সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। ডুয়ার্স-তরাই-এর চা-বাগানকে ঘিরে গড়ে উঠেছে যেসব হাটবাজার বা জনপদ, সেখানেও শোকের পরিবেশ। শ্রমিকদের হাতে পয়সা নেই, তাই হাটে-বাজারেও বিক্রিতে মন্দা — এলাকার অর্থনীতিতে এই চাপ আরো কয়েক হাজার মানুষের পরিবারে এনেছে চরম দুঃসময়। প্রশ্ন হল, কেন এই সঙ্কট?

চা-শিল্পে মন্দা নেই

চা-মালিকরা বলবার চেষ্টা করছে যে চা-শিল্পে মন্দা দেখা দিয়েছে, বাজার নেই, তাই এই সঙ্কট। কিন্তু এটা যে কত বড় মিথ্যাচার তা পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায়। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রকের হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, “গত আর্থিক বছরে বিদেশে চা-রপ্তানি করে এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়েছে প্রায় ১৮০০ কোটি টাকা। চলতি আর্থিক বছরে এই লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা কতটা পূরণ হবে তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। কারণ ২০০১ সাল থেকেই এদেশে চায়ের উৎপাদন-লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা আছে ১ হাজার মিলিয়ন (১০০ কোটি) কিলোগ্রাম। কিন্তু এখন পর্যন্ত এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা হয়নি। গত আর্থিক বছরে এদেশে চা-উৎপাদন হয়েছে ৮৫০ মিলিয়ন (৮৫ কোটি) কিলোগ্রাম।” অর্থাৎ ২০০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের লক্ষ্যে যে পরিমাণ উৎপাদন মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই পরিমাণ উৎপাদনই হয়নি। অর্থাৎ চা-উৎপাদনের ক্ষমতার এবং চাহিদার তুলনায় উৎপাদন হয়েছে কম।

আর দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার যে কতগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তা বোঝা যাবে যদি ভারতের মোট চা-উৎপাদনের কত অংশ দেশীয় বাজারে বিক্রি হয় তার পরিসংখ্যান দেখা যায়। যেখানে, ১৯৫০ সালে ৬৭৩১টি চা-বাগানের (সারা দেশ মিলিয়ে) মোট উৎপাদনের ২৪.৮ শতাংশ দেশীয় বাজারে বিক্রি হতো, সেখানে ২০০০ সালের হিসাব অনুযায়ী ৩৮৭০০ নথিভুক্ত চা-বাগানের (সারা দেশে) মোট উৎপাদনের ৭৬ শতাংশ চা আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ বাজার সঙ্কুচিত তো হয়ই নি, বরং বেড়েছে কয়েকগুণ।

ফলে কি বৈদেশিক, কি আভ্যন্তরীণ কোনো বাজারেই ভারতীয় চায়ের বাজারসঙ্কট নেই। বৈদেশিক চায়ের বাজারে কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশ ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টা করলেও সামান্য কিছু হ্রাস-বৃদ্ধির কথা বাদ দিলে (যেটা ‘আদর্শ’ বাজারেও থাকে) সামগ্রিকভাবে ভারতীয় চায়ের বিপদ বা সঙ্কট দেখা দেয়নি। আর সরকার দেশীয় বাজারে বিদেশী চায়ের আমদানিতে কিছু কর-ছাড় দিলেও আভ্যন্তরীণ চাহিদা যেখানে ৭৬ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিপদের কথা বলা মতলববাজি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং চা-শিল্পে সঙ্কটের কথা বলা চরম মিথ্যাচার ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে!

কেউ কেউ এই প্রসঙ্গে বলেন, একদা সোভিয়েট রাশিয়া ছিল ভারতীয় চায়ের বড় খদ্দের। তার পতনের পর (১৯৮৯) বহু ছোট ছোট রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং ভারতীয় চা-রপ্তানি বহুলাংশে কমে যায়। এটাই নাকি সঙ্কটের কারণ। একথা একেবারেই অসত্য। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত চা-শিল্পে মুনাফার হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ১৯৯৭ সালে মুনাফার সর্বকালীন রেকর্ড করেছিল চা-শিল্প। ১৯৯৮/১৯৯৯ সালে মালিকরাই উচ্চহারে ২০% বোনাস দিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতনজনিত কারণেই যদি বৈদেশিক বাজারের অবিক্রীত চা, সঙ্কট এনে দিয়ে থাকত, তবে এই ঘটনা কি ঘটতে পারত? সোভিয়েট ইউনিয়নের পতনের পরেই তো ১৯৯০ সাল থেকে চা-শিল্পে মুনাফার ঊর্ধ্বগতি হয়েছে! আসলে সোভিয়েটের পতনের পরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি আলাদা করে যেমন চা কিনেছে আবার প্রথম দিকে যা কিছু ঘাটতি হয়েছে তা পুষিয়ে গিয়ে পরে অনেকগুণ চাহিদা বেড়েছে বৈদেশিক বাজারে এবং দেশীয় বাজারে।

কেউ কেউ বলেছেন, চা-শিল্পে উৎপাদন-ব্যয় বেড়েছে, আর তাই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য উৎপাদন-ব্যয় কমানো দরকার, দরকার শ্রমিক ছাঁটাই, শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা খর্ব করা। এছাড়া চা-শিল্প বাঁচানোর নাকি অন্য কোন পথ নেই। এটাও মিথ্যাচার।

উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম উপাদান হল মজুরের মজুরিবৃদ্ধি, মজুরকে দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। এর সাথে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদান সার, কীটনাশক ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধি। একথা ঠিক, সার ও কীটনাশকের দাম সামান্য বেড়েছে। কিন্তু সেটার পরিমাণ আর কত? উল্টোদিকে শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি না দেওয়ার পরিমাণ, সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার পরিমাণ যে কত বেশি তা কল্পনাই করা যায় না। “এই মুহূর্তে চা-শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুয়িটি বাবদ মালিকের কাছে পাওনা অন্তত ১০০ কোটি টাকা।” (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২/১/০৩) উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে নিয়োজিত প্রায় অর্ধেক মজুরের কোয়ার্টার্স নেই। অধিকাংশ বাগানে (প্রায় ৭০ শতাংশ) নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। আইন অনুযায়ী এসব মালিকদেরই দেবার কথা। আরো আশ্চর্যের কথা হল, চা-মালিকরা যখন খরচের হিসাব দাখিল করে তখন এইসব বাবদ খরচের কথা উল্লেখ করতে কেউই ভোলে না। বাস্তবে, এসব সুযোগ সুবিধাগুলি চা-শ্রমিকদের মজুরিরই অংশ (part of the wage)। সেগুলো না দিয়েই তারা খরচের মিথ্যা হিসাব দাখিল করে। বাগানে কোনো নূতন নিয়োগ নেই। অথচ ‘কাদের নওয়াজ কমিটি’র রিপোর্ট (১৯৬৯) অনুযায়ী প্রতি একরে একজন স্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করার কথা। ১৯৬৯ সালের পর বহু বাগানই সম্প্রসারিত হয়েছে, অথচ দীর্ঘদিন সেই অনুযায়ী স্থায়ী মজুর নিয়োগ হয়নি। ১৯৯৮ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উপস্থিতিতে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে মালিকপক্ষ ১০ হাজার নূতন মজুর নিয়োগের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। সেই নিয়োগও হয়নি। এখন আবার সেই চুক্তি তারা মানতেও চাইছে না। আর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সমস্ত শিল্পের তুলনায় চা-শিল্পে মজুরির হার সব চাইতে কম। ফলে তুলনামূলকভাবে উৎপাদন ব্যয় খুব বেশি বাড়েনি তো বটেই, বরং মালিকপক্ষ এতদিনের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাগুলি বিপুল পরিমাণে কেটে-ছেঁটে দিয়ে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা আত্মসাৎ করে বিপুল পরিমাণে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলেছে। ফলে কী বৈদেশিক বাজারে চাহিদা, কী আভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদা, বা উৎপাদন - খরচের সমস্যা — কোনো ক্ষেত্রেই মালিকদের সঙ্কট নেই। বরং আছে প্রচুর লাভের হাতছানি। তা না হলে কোকাকোলার মত কোম্পানি চা-ব্যবসায় ঢুকছে কেন?

বর্তমানে চা-শিল্প মালিকদের লুটপাটের জায়গা

তাহলে কি সেই কারণ, যে কারণে মালিকপক্ষ চা-শিল্পে সঙ্কটের ধুয়ো তুলে চা-শ্রমিকদের জীবনে ভয়াবহ সঙ্কট ডেকে এনেছে? এর কারণ শ্রমিকদের প্রতারিত করে সরকারের সহায়তায় মালিকদের অতি মুনাফা লাভের নগ্ন লালসা।

মালিকদের কাছে বর্তমানে টাকা-লুট ও তছরূপের অন্যতম জায়গা হয়েছে চা-শিল্প। প্রথমত মালিকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আজ কারবারি (traders) — তারা শিল্প চালাবার দীর্ঘকালীন পরিকল্পনার মানসিকতা নিয়ে আসে না, তারা আসে চটজলদি মুনাফা করতে বা টাকা লুট করতে। সাম্প্রতিককালে মালিকানার ঘন ঘন হাতবদলের যে পরিসংখ্যান রয়েছে সেটাই একথার সারবত্তা প্রমাণ করে। চা-বাগানের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণ নেওয়া হয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি থেকে, যে ঋণের অল্প অংশই বাগানের উন্নয়ন বা প্রসারণের কাজে বিনিয়োগ করা হয়। বেশিরভাগ টাকাই আত্মসাৎ করা হয়। শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা মজুরের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া হয় তা জমা না দিয়ে মালিক আত্মসাৎ করে। নতুন গাছ রোপণের জন্য টি বোর্ড থেকে যে অনুদান পায় তা গাছ না লাগিয়ে খরচ দেখিয়ে আত্মসাৎ করা হয়। এভাবে কয়েক বছরের মধ্যে বাগানকে ‘রুগ্ন’ করে ফেলা হয়। তারপর সে বাগান বেচে দেওয়া হয়। নতুন মালিক যখন বাগান কিনে চালাতে শুরু করে তখন শ্রমিকের বকেয়া টাকা বা দাবি দাওয়া মেটানোর অক্ষমতা জানিয়েই সেটা শুরু করে। সেও আবার একই ভাবে বাগানকে ছিবড়ে করে ফেলবার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নতুন কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সহায়তায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সম্প্রতি “স্টেট ব্যাঙ্কের ঋণের দায় মেটাতে না পেরে বিক্রি হল যোগেশ চন্দ্র চা কোম্পানির বাগান। স্টেট ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ বাকি থাকতেও সেই বাগানকে নতুন করে ঋণ দেয় ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক।” (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২/১/০৩) বক্সা দুয়ার টি কোম্পানির তিনটি চা-বাগান সম্পর্কে রিপোর্ট বের হয়েছে — “মাস ছয়েক আগে এমন রুগ্ন বাগানকে ব্যাঙ্ক অব বরোদা ঋণ দিয়েছে ১০ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।” (উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২/১/০৩) এমন উদাহরণ বহু আছে। ব্যাঙ্ক, টি-বোর্ড, সরকার বা বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে পাওয়া ঋণ বা অনুদানের টাকা বাগানে উৎপাদনের অগ্রগতির স্বার্থে, পরিচর্যা ও প্রসারণের কাজে না লাগিয়ে এভাবে লুট করা হয়েছে এবং হচ্ছে। এরজন্য পুরোপুরি দায়ী মালিকদের অতি মুনাফার নির্লজ্জ লোভ। তাই, কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রকের উদ্যোগে সাংসদ সি পি রাধাকৃষ্ণনের নেতৃত্বে আটজনের যে সংসদীয় প্রতিনিধিদল স্বল্পকাল আগে চা-

চারের পাতায় দেখুন

চা-শ্রমিকদের জোরদার লড়াই করতে হবে

তিনের পাতার পর

শিল্পের অবস্থা পর্যবেক্ষণে উত্তরবঙ্গ সফর করে গেলেন তাঁরাও বলতে বাধ্য হয়েছেন — "এ অঞ্চলে চা-শিল্পের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে যা বলা হচ্ছে তার জন্য শ্রমিকদের দায়ী করা চলবে না। চা-শিল্পের উন্নতিকল্পে মালিকদের যা করণীয় ছিল তা তাঁরা করেননি।" (উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ৩০/১০/০২)।

'সঙ্কট'এর বাতাবরণ তৈরির পেছনে ষড়যন্ত্র

ফলে একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে চা-শিল্পে "সঙ্কট — ভয়ানক সঙ্কট" বলে প্রচারের যে বাতাবরণ মালিকরা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে এবং কিছু কিছু এজেন্সি তাদের হয়ে যে প্রচার তুলেছে, তার পেছনে রয়েছে হীন কোন উদ্দেশ্য। সঙ্কটের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারলে একদিকে মালিকপক্ষ যেমন শ্রমিকদের আরো বঞ্চিত করে আরো বেশি মুনাফা করতে পারবে, আবার একই ধুয়ো তুলে সরকার, ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক অন্য সংস্থাগুলি থেকে খুব সহজেই টাকা নিংড়ে নিতে পারবে, ট্যাক্স ছাড় সহ আরো কিছু অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করে তাদের মুনাফার অঙ্ককে আরো বাড়াতে পারবে। সাধারণ মালিকানার বাগান তো বটেই, এমনকি বহুজাতিক কোম্পানির বাগানগুলোও সঙ্কটের দোহাই দিয়ে, এখন রেশন দেওয়া পিছিয়ে দিচ্ছে বা বকেয়া রাখছে, মজুরি দেওয়া পিছিয়ে দিচ্ছে, আইনগতভাবে যেসব সুযোগ সুবিধা শ্রমিকদের প্রাপ্য তাও বন্ধ করে দিচ্ছে। ডানকান, গুডরিক, উলিয়ামসন-ম্যাগর, টাটা-টি ইত্যাদি সংস্থা পরিচালিত বাগানেও এসব শুরু হয়েছে। আর যে সমস্ত মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে দিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তারা বাগান খোলার শর্ত হিসাবে মজুরকে অর্ধেক মজুরিতে কাজ করার প্রস্তাব দিচ্ছে। সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হল, সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে মহকুমা বা জেলা শাসক যিনি এই সভায় উপস্থিত থাকছেন তিনিও মালিকদের এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য মজুরদের পীড়াপীড়ি করছেন। ফলে মালিকদের ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে — শ্রমিকদের আরো বেশি করে নিংড়ে নিয়ে মুনাফার পাহাড় গড়ছে তারা, আর জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চিৎকার করছে "সঙ্কট, সঙ্কট"।

'এই সময়' (এক)

প্রশ্ন উঠতে পারে চা-মালিকরা সঙ্কটের ধুয়ো তুলতে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসটাকেই বেশি করে বেছে নিয়েছে কেন? তাদের ষড়যন্ত্র হাসিল করার ক্ষেত্রে 'এই সময়'টা এক বিশেষ অর্থবহ। অর্থাৎ এই সঙ্কটের রব তোলার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল 'এই সময়'। বছরের এই সময়টাতে, যখন বাগানগুলো বন্ধ করা শুরু হল, তখন বাগানে পাতা তোলার কাজ বন্ধ থাকার সময়। সাধারণভাবে এই সময়ে বাগানে শুধুমাত্র পরিচর্যার কাজ চালু থাকে — নতুন গাছ লাগানো, বুড়ো গাছ তুলে ফেলা, জলনিকাশী ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি যে কাজে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রমিক হলেই চলে যায়। এই সময় বাগান বন্ধ করলে মালিকের ক্ষতি নেই। তাই এই সময় সঙ্কটের ধুয়ো তুলে বাগান বন্ধ করে পালিয়ে গেলে অসংখ্য দরিদ্র শ্রমিক পরিবারের প্রতি ন্যূনতম যে আর্থিক দায়দায়িত্ব চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ীই মালিকের উপর থাকে তাকে তারা ঝেড়ে ফেলতে পারে। মালিকরা জানে নানা অছিলায়, সরকারি ঔদাসীন্য বা সহযোগিতায়, এই দু-তিন মাস সময় কাটিয়ে দিতে পারলে তাদের মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। তারপর লেবার কমিশনারের বৈঠকে কয়েকবার অনুপস্থিত থেকে কালক্ষেপ করার পর 'সময়' মত আবার বৈঠকে বসে উৎপাদন শুরু করার প্রাক্‌মুহূর্তে বাগান খুলতে পারলে অসুবিধা কিছু তো হয়ইনা, বরং আরো লাভ হয়। কারণ, এই শর্তেই তারা বাগান খোলে যে এই মধ্যবর্তী সময়ের বেতন তারা দেবে না বা আংশিক দেবে বা পরে কখনো দেবে। অনন্যোপায় শ্রমিককে তার নিজ স্বার্থবিরোধী কম মজুরির চুক্তিতে সই করিয়ে কাজে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়।

এই রাজ্যের চটকলের ক্ষেত্রেও মালিকরা এই কৌশলে বছরে কয়েক মাসের জন্য চটকল বন্ধ করে রাখে এবং পরে উৎপাদনের সময় এলে সুবিধাজনক শর্তে কারখানার গেট খোলে। একই কৌশল তারা এবার নিল চা-শিল্পে।

ইতিমধ্যে এই প্রক্রিয়াতে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জেলা শাসক নিজে শ্রমিক নেতাদের অনুরোধ করেন অর্ধেক মজুরিতে বাগান খোলার মালিকের প্রস্তাবে রাজি হতে। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে এখন এসবই আলোচ্য বিষয়। দুঃখের বিষয় হলেও এটা সত্য, 'ইনডং' চা-বাগানে শ্রমিকরা ৬ দিনের কাজ করে ৩ দিনের বেতন নেবেন এই শর্তে রাজি করিয়ে বাগান খুলে দেওয়া হয়েছে। বক্সার দুয়ার টী কোম্পানীর ৩টি বাগানেও অর্ধেক মজুরিতে বাগান খোলার চেষ্টা চলছে।

'এই সময়' (দুই)

চা-বাগান বন্ধ করার যে প্রক্রিয়া মালিকরা ষড়যন্ত্র করেই শুরু করেছিল তাদের কাছে আরো একটি কারণে 'এই সময়' গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিজেপি পরিচালিত (তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত) কেন্দ্রীয় সরকার দেশী-বিদেশী মালিকদের অঢেল সুযোগ দেবার জন্য যে অর্থনৈতিক 'সংস্কার' (reform) কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য তারা এখন প্রবলভাবে উদ্যোগী হয়েছে। ফলে চা-মালিকরা বুঝে গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পেছনে থাকবে, তাই তারা বিজেপি নেতাদের কঠোর মনোভাবের প্রশংসা করেছে। আবার রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে হারে পুঁজিপতিদের অভয়বাণী, আশ্বাসবাণী দিয়ে চলেছেন তাতেও মালিকপক্ষ উৎসাহিত হয়েছে। "জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন বরদাস্ত করা হবে না", "মালিকরা বলুন সরকার কিভাবে তাদের সাহায্য করতে পারে," ইত্যাদি খোলাখুলি আহবানের মধ্য দিয়ে মালিকপক্ষের কাছে রাজ্য সরকারও যে বাণী পৌঁছে দিয়েছে তা হল, মালিকরা এগিয়ে আসুন, সরকার আপনাদের পাশে আছে। বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, হাসপাতালের বেসরকারীকরণের কৌশলী প্রচেষ্টা, জলকরবৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটিয়ে এই সরকার যেমন তাদের মালিকসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির বাস্তব প্রমাণ দিয়েছে, আবার পুলিশ-প্রশাসন দিয়ে নির্বিচারে জনপ্রতিরোধ দমন করে প্রমাণ দিয়েছে যে মালিকদের স্বার্থরক্ষা করতে তারা কঠোর হতেও দ্বিধা করবে না। ফলে মালিকপক্ষ খুবই উৎসাহিত হয়েছে। তারা মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করছে। তার ভাষণকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে বণিক সভার নেতারা। ফলে 'এই সময়' মালিকপক্ষের কাছেও সুসময়, একথা চা-মালিকরাও বুঝতে পেরেছেন। বুদ্ধদেববাবু একদা নাট্যকার হিসাবে 'দুঃসময়' নামে একটি নাটক লিখে ও মঞ্চস্থ করিয়ে নাম করেছিলেন। এখন, নাটকে নয়, বাস্তবে মালিকপক্ষের হয়ে 'সুসময়' ঘোষণা করে মালিকপক্ষের কাছে প্রশংসা বা নাম কিনেছেন। বাস্তবে রাজ্য সরকার এর প্রমাণও দিয়েছে। গত আগস্ট মাসে ডুয়ার্সের দুমচিপাড়া চা-বাগানে বাগান কর্তৃপক্ষ হঠাৎ করে শ্রমিকদের বেতন বন্ধ করে দেয় এবং বলে, এই বেতন তারা পরে কোন এক সময়ে দেবে। স্বাভাবিক কারণেই শ্রমিকরা বিক্ষুব্ধ হয় এবং কারখানার গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে। সেই অবস্থান তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার শ'য়ে শ'য়ে পুলিশ পাঠায়। কোথাও কোন অশান্তি হয়নি, কোনো ভাঙচুর করা হয়নি, কোনো মারপিটের ঘটনাও ঘটেনি, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ারও কোন চিহ্ন ছিল না — অথচ সরকারের পুলিশ সেই নিরস্ত্র অসহায় শ্রমিকদের উপর নির্দয়ভাবে লাঠিচার্জ করে অবস্থান তুলে দেয়। শুধু তাই নয়, রাতের অন্ধকারে শ্রমিক বস্তিতে ঢুকে পুলিশ ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে চালান করে দেয়; শ্রমিকদের ২৮ দিন হাজতে কাটাতে হয়। এইভাবে আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাজ্য সরকার মালিকপক্ষের কাছে তাদের দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখেছে। ফলে মালিকরা এই পরিস্থিতির সুযোগ নিংড়ে নিতেই নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে বাগান বন্ধ শুরু করে দেয়।

রাজ্য সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের ভূমিকা

চা-মালিকদের এই ষড়যন্ত্রমূলক সঙ্কট-সৃষ্টির ঘটনা যখন আলোড়ন সৃষ্টি করে তখন ক্ষমতাসীন দলগুলির দ্বারা পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের চাপে কিছু আবেদন-নিবেদন করতে বাধ্য হয় মাত্র। এর বাইরে তারা আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার কোন চেষ্টা করেনি। তাদের ভূমিকা যেমন নৈরাশ্যজনক, তেমনি রাজ্য সরকারের ভূমিকাও সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছে। মালিকরা শ্রম-কমিশনারের ডাকা ত্রিপাক্ষিক বা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকেও হাজির হওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। মালিকদের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ মনোভাবের সামনেও উক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলি ও রাজ্য সরকার কোন কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেনি। বরং সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে নানা বৈঠকে উপস্থিত ডি এম, এস ডি ও-রা মালিকপক্ষের শর্তের কাছে শ্রমিক ইউনিয়নগুলিকে আত্মসমর্পণের জন্য আবেদন জানান। জলপাইগুড়ির ডি-এম বৈঠকে শ্রমিক নেতাদের এইরকম প্রস্তাবও দেন যে অর্ধেক বেতন নিয়ে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলতে শ্রমিক নেতাদের যদি অসুবিধা থাকে তবে তারা যেন স্থানীয় ভিত্তিতে (local adjustment) প্রস্তাব মেনে শ্রমিকদের কাজে যোগ দিতে বলেন। গত ৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়িতে এমন একটি বৈঠকে ডি-এম মালিকের পক্ষ নিয়ে বলেন যে মালিকদের পক্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব নয়। রাজ্য সরকার যদি না চাইত তাহলে বৈঠকে ডি-এম/এস-ডি-ওরা কি এহেন প্রস্তাব দিতে ও মালিকী স্বার্থরক্ষাকারী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারতেন?

রাজ্য সরকার চাইলে আইন অনুযায়ীই অনেক ব্যবস্থা নিতে পারত। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের প্রায় ১০০ কোটি টাকা মালিকরা বকেয়া রেখেছে। আইন অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে মালিকদের দেয় টাকা বকেয়া রাখা অপরাধ, শ্রমিকের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া টাকা বকেয়া রাখা অধিকতর অপরাধ। এই অভিযোগে (Section 409 IPC) গ্রেপ্তার করলে তা জামিন অযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। অথচ সরকার কোন ব্যবস্থা নেয়নি। সরকার চাইলে শর্ত অনুযায়ী সরকারি জমির 'লিজ' বাতিল করে দিতে পারত — সেটাও তারা করেনি। এমনকি এই ধরনের হুমকিটুকু পর্যন্ত দেয়নি। বরং সরকারের কোন এক মন্ত্রী হতাশা ব্যক্ত করে বলেছেন — "সরকারের কী আর করার আছে!" ত্রিপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে মালিকরা উপস্থিত না হওয়ার ফলে যখন বৈঠকগুলি ভেস্তে যাচ্ছে, কোনো সমাধানে পৌঁছানো যাচ্ছে না, তখন সরকারি কর্তারা বলেছেন "মালিক না এলে কী আর করা যাবে।" সরকার চাইলে 'লিজ' বাতিল করতে পারত, মালিকদের গ্রেপ্তার করতে পারত। এমনকি বাগান অধিগ্রহণও করতে পারত। এসব না করে রাজ্য সরকার মালিকদের তোষামোদ করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মালিকদের আরো নানারকম করছাড় দেবার কথা ঘোষণা করছে। সিটু, আই-এন-টি-ইউ-সি সহ বড় বড় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতারাও মাঝে মাঝে অর্ধবেতনে কাজ করানোর পক্ষে সওয়াল করে বলেছেন 'বাগান তো আগে খুলুক, পরে দেখা যাবে।' ত্রিপাক্ষিক বৈঠকগুলিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত ইউনিয়ন, নর্থবেঙ্গল টি-প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (NBTPEU)-এর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকায়, তার প্রতিবাদের সামনে পড়ে, মালিক পক্ষের হয়ে পুরোপুরি কাজে নেমে পড়তে তারা বিরত থাকলেও নীচু তলায় তাদের নেতারা মালিকপক্ষের শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য শ্রমিকদের

আটের পাতায় দেখুন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের প্রতিবাদে

এস ইউ সি আই-এর বিশাল বিক্ষোভ মিছিল

ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী সমরচক্রের আক্রমণের প্রতিবাদে এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে গত ২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় এক বিশাল বিক্ষোভ মিছিল জওহরলাল নেহরু রোডে মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায়।

কলেজ স্কোয়ার থেকে বিকাল ৩টায় মিছিল শুরু হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে ও ইরাকের জনগণের সমর্থনে দৃপ্ত শ্লোগানে মুখর এই মিছিলে নেতৃত্ব দেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী। মিছিল লেনিন সরণী হয়ে ধর্মতলায় পৌঁছালে দুই মার্কিন পর্যটক ইলিয়াস ওয়েট ও ভিভিয়ান, বুশ-ব্লেয়ারের বিরুদ্ধে শ্লোগানে গলা মিলিয়ে ঐ মিছিলের সাথী হন।

মিছিল মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে পৌঁছালে পুলিশ গতিরোধ করে। ওখানে এক সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, একথা আজ পরিষ্কার যে, ইরাকের তেলভান্ডার দখলের জন্য এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির তীব্র সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাক আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে। যুদ্ধাস্ত্র শিল্পকে চাঙ্গা করে মার্কিন শাসকরা তীব্র মন্দার কবল থেকে বাঁচতে চাইছে। পাশাপাশি যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি করে নিরাপত্তার জিগির তুলে মার্কিন শাসকরা নাগরিক অধিকারের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে, গণআন্দোলনকে ধ্বংস করতে চাইছে।

এই যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে এবার খোদ আমেরিকা সহ বিশ্বের দেশে দেশে জনগণ যেভাবে লাখে লাখে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বিশ্ব আজ কার্যত দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে, যার একদিকে আছে সাম্রাজ্যবাদ অপরদিকে বিশ্বের জনগণ। এই জনগণের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ-জাতের কোন ভেদ নেই, এদের একটাই পরিচয় এরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সৈনিক।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, বিশ্বজনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এইভাবে দস্যুবৃত্তি চালাতে পারত না যদি আজ লেনিন-স্ট্যালিনের হাতে গড়া সোভিয়েট ইউনিয়ন থাকত। ১৯৫৩ সালে মিশর সুয়েজ ক্যানেল জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা মিশর আক্রমণের হুমকি দিলে, সোভিয়েট ইউনিয়ন পাল্টা হুমকি দিয়ে বলেছিল, মিশরে হামলা হলে সোভিয়েট বিমান লন্ডনে বোমা ফেলবে। ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদীরা বাধ্য হয়ে পিছু হঠেছিল। শক্তিধর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়ন এভাবেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধে শান্তির দুর্গ হিসাবে কাজ করেছিল।

তিনি বলেন, ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ঐতিহ্য অনুযায়ী, ভারত সরকারের যেমন বলিষ্ঠভাবে মার্কিন যুদ্ধচক্রান্তের বিরুদ্ধতা করা উচিত ছিল কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তা করছে না। মৌখিক কিছু মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে, ভারত সরকার কার্যক্ষেত্রে আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাথে নানা সামরিক চুক্তি করছে, যৌথ সেনামহড়ার ব্যবস্থা করছে।

তিনি বলেন, সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধ ছাড়া বাঁচতে পারেনা, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে, যুদ্ধের বিপদও ততদিন থাকবে আবার এই যুদ্ধই সাম্রাজ্যবাদের কবর খুঁড়বে।

সভা শেষে, মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের একটি কুশপুতুল পোড়ানো হয়। এতে অগ্নিসংযোগ করেন কমরেড রণজিৎ ধর, অগ্নিসংযোগে হাত মেলান মিছিল যোগদানকারী দুই মার্কিন নাগরিকও।

২ ফেব্রুয়ারি বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ। (ইনসেটে বাঁদিক থেকে) নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমরেডস্ মানিক মুখার্জী, প্রভাস ঘোষ এবং রণজিৎ ধর। (আরও ছবি আটের পাতায়)

৪০ হাজার মার্কিন নাগরিকের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্র

'আমাদের স্বার্থরক্ষার নামে এই অন্যায় অযৌক্তিক বেআইনি যুদ্ধ চালিও না'

[সম্প্রতি আমেরিকার ইরাক নীতির প্রতিবাদে সে দেশের ৪০ হাজারেরও বেশি বিশিষ্ট নাগরিকের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবাদপত্রটির বঙ্গানুবাদ এখানে প্রকাশ করা হল।]

যখন মার্কিন সরকার দমনপীড়নের নতুন নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছিল, বিশ্ববাসীর বিরুদ্ধে এক অন্তহীন যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তখন তার বিরুদ্ধে আমরা, মার্কিন জনগণ, কিছুই করিনি একথা যেন কেউ না বলে।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর যে সমস্ত নীতি নেওয়া হচ্ছে, যে সামগ্রিক রাজনৈতিক লক্ষ্যে দেশকে পরিচালিত করা হচ্ছে, এবং যা সমগ্র বিশ্বের জনগণের সামনে গুরুতর বিপদ সৃষ্টি করেছে, আমরা, এই ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরকারীবৃন্দ, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য মার্কিন জনগণের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

আমরা বিশ্বাস করি, বৃহৎ শক্তির সামরিক দমনমুক্ত হয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার মানুষের ও জাতিসমূহের রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, মার্কিন সরকার যে সমস্ত মানুষকে বিনাবিচারে আটক রেখেছে বা আদালতে অভিযুক্ত করেছে তাদেরও এই একই আইনি অধিকার আছে। আমরা বিশ্বাস করি, প্রশ্ন করা, সমালোচনা করা বা ভিন্নমত প্রকাশের অধিকারকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে, রক্ষা করতে হবে। আমরা জানি এই অধিকার ও মূল্যবোধগুলি দাবি করলেই সর্বদা তার বিরুদ্ধতা করা হয় এবং সেজন্য লড়াই করেই তা প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

আমরা মনে করি, দেশের সরকার যা করে তার দায়দায়িত্ব সে দেশের বিবেকবান জনগণ অস্বীকার করতে পারে না — আমাদের স্বার্থরক্ষার নামে যে অন্যায় করা হচ্ছে প্রথমেই তার বিরোধিতা করা আমাদের দায়িত্ব। একারণে আমরা সমগ্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসীর প্রতি আহবান জানাচ্ছি — বুশ প্রশাসন গোটা দুনিয়ার উপর যুদ্ধ ও দমনপীড়নের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছে তাকে প্রতিরোধ করুন। এই যুদ্ধ অন্যায়, অনৈতিক, বেআইনি। আমরা সমগ্র বিশ্বের জনগণের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে চাই।

আমরাও তীব্র বেদনার সাথে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ এর ভয়ঙ্কর ঘটনা লক্ষ্য করেছি। হাজার হাজার নিরীহ মানুষের মৃত্যুতে আমরাও শোকাহত হয়েছি এবং এই ব্যাপক হত্যালীলার বীভৎস দৃশ্য আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি। সাথে সাথে বাগদাদ, পানামা শহর এবং এক প্রজন্ম আগে ভিয়েতনামেও একই ধরনের দৃশ্যের কথা আমরা স্মরণ না করে পারি না। লক্ষ লক্ষ যন্ত্রণাবিদ্ধ প্রশ্নময় মার্কিন নাগরিকের সাথে আমরাও সমস্বরে একথা জিজ্ঞাসা না করে পারিনা — কেন এমন ঘটল?

কিন্তু দেশময় শোকপ্রকাশ যখন সবে শুরু হল, তখনই দেশের সর্বোচ্চ নেতারা প্রতিশোধের মনোভাব ছড়িয়ে দিলেন। শুভ বনাম অশুভ এই অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা দিল এবং বাধ্য ও বশীভূত প্রচার মাধ্যম সরকারি ব্যাখ্যাকেই তাদের প্রচারের সারবস্তু করে ফেলল। তারা আমাদের বলল, কেন এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে — তা নিয়ে তর্ক করা চলবে না, কোন রাজনৈতিক বা নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপন করা চলবে না, কারণ এই ধরনের কোনও প্রশ্ন নাকি থাকতেই পারে না।

আমাদের নামে বুশ প্রশাসন, কংগ্রেসের প্রায় ঐকমত্যের সহায়তায় শুধু আফগানিস্থানকেই আক্রমণ করল না, সে এবং তার মিত্ররা নিজেরাই ঘোষণা করল দুনিয়ার যে কোন জায়গায় যে কোন সময়ে সামরিক বাহিনী নামিয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের আছে। সরকার এখন ইরাকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ পরিকল্পনার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ১১ সেপ্টেম্বরের নারকীয় ঘটনার সাথে ইরাকের কোন সম্পর্কই নেই। যেখানেই চাইবে সেখানেই বোমা ফেলতে পারবে, গুপ্তঘাতক বা কমাণ্ডো পাঠাতে পারবে — আমেরিকাকে যদি এই অবাধ অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এই বিশ্বের চেহারা কী দাঁড়াবে?

আমাদের স্বার্থরক্ষার নামে, আমেরিকার অভ্যন্তরে সরকার দুই শ্রেণীর নাগরিক তৈরি করেছে। এক শ্রেণীর নাগরিককে মার্কিন বিচার ব্যবস্থার সমস্ত অধিকার দেওয়ার অন্ততপক্ষে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে, এবং অপর এক শ্রেণীর নাগরিক —

ছয়ের পাতায় দেখুন

মহাকাশচারীদের মর্মান্তিক মৃত্যু — অন্য কিছু প্রশ্ন

মহাকাশ অভিযান শেষ করে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসার মাত্র পনেরো ষোল মিনিট আগে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে মার্কিন মহাকাশযান কলম্বিয়া। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে সাতজন মহাকাশচারীর জীবন — এদের মধ্যে একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত আমেরিকার নাগরিক কল্পনা চাওলা। যেকোন দুঃসাহসিক অভিযানের মত মহাকাশ অভিযানে স্বেচ্ছায় অংশ নেন যেসব মহাকাশচারীরা সাহস ও গবেষণার উদ্যমের বিচারে তারা অগ্রণী। তাই এমন এক অভিযানে সাতসাতটি তাজা প্রাণ নিমেষে শেষ হয়ে যাওয়া এক মর্মান্তিক ঘটনা। বিশেষজ্ঞরা শোকাহত পৃথিবীকে এই বলে খানিকটা সান্ত্বনা দিতে চেয়েছেন যে বিস্ফোরণের মুহূর্তে মহাকাশযানের তাপমাত্রা এমন এক মারাত্মক জায়গায় পৌঁছেছিল, (প্রায় ২৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড), যেখানে মস্তিষ্কে কোন যন্ত্রণা অনুভব করার আগেই গোটা মানবদেহ সম্পূর্ণ বায়বীয় অবস্থায় চলে গিয়েছিল — তাই মহাকাশচারীদের অন্তত মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু এর দ্বারা না হয় সাফাই, না হয় সান্ত্বনা! এসব কথা মূল্যহীন।

মহাকাশে দুর্ঘটনা এই প্রথম নয়। ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে ছত্রিশ বছরে বড় ধরনের পাঁচটি দুর্ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটেছিল মার্কিন অভিযানে (১৯৬৭, ১৯৮৬, ২০০৩), দুটি তদানীন্তন সোভিয়েট দেশের (১৯৬৭, ১৯৭১) অভিযানে। মার্কিন অভিযানের দুর্ঘটনায় ১৭ জন, সোভিয়েট অভিযানের দুর্ঘটনায় চারজন নভশ্চর মারা গিয়েছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, মহাকাশ অভিযানের গোড়ার যুগে ঘটেছিল তিনটি দুর্ঘটনা, বাকি দুটি গত এক দশকের মধ্যে। অথচ প্রযুক্তির যে অভূতপূর্ব উন্নতির কথা বলা হয়, তা মনে রাখলে তো প্রশ্ন জাগে, এমন উন্নতি সত্ত্বেও গত এক দশকে মার্কিন অভিযানে দুটি দুর্ঘটনা ঘটল কি করে?

এবারের কলম্বিয়া ধ্বংস হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন কিছু প্রশ্ন উঠেছে, যা শুধু আমেরিকারই নয়, বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে বিচলিত করেছে। একথা ঠিক যে আজকে কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই যে মহাকাশ অভিযানগুলি হয় — তার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে সামরিক। সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক-কারিগরি-সাংগঠনিক ক্ষমতা কত তা দেখিয়ে বিশ্বের কাছ থেকে ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম আদায় করাও অভিযানগুলির আর এক লক্ষ্য। মার্কিন মুলুকের এইসব অভিযানের বিশাল অর্থের অনেকটাই জোগায় করপোরেট হাউস; তাদের লাভ লোকসানের অঙ্ক তো এগুলির সঙ্গে অবশ্যই জড়িত। (কলম্বিয়া অভিযানও ছিল 'কমার্শিয়ালি স্পনসর্ড' অর্থাৎ বাণিজ্যিক সংস্থার অর্থ ছিল এর পিছনে) তবু এই সমস্ত অভিযানের মধ্য দিয়ে যেসব তথ্য জানা যায়, তা শেষ পর্যন্ত গোটা মানবজাতির সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। কলম্বিয়া মহাকাশযানের ১৬ দিনের অভিযানেও মহাকাশচারীরা প্রায় আশিটির বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্যতম হল কৃত্রিম উপগ্রহের কক্ষপথের মাইক্রো-গ্র্যাভিটি বা অণুমাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে যখন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের শক্তিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়, তখন ভৌতপদার্থ, রাসায়নিক উপাদান বা ক্রিয়াপ্রক্রিয়া এমনকি জীবজগত তথা মানুষের শারীরবৃত্তের উপর তার কি প্রভাব পড়ে, তার খুঁটিনাটি সংগ্রহ করা। স্পষ্টতই এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সংগৃহীত তথ্য পরবর্তীকালে পৃথিবী ও মহাকাশে জড়পদার্থ ও জীব সংক্রান্ত গবেষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারত (নাসার 'স্পেস রিসার্চ -এ প্রকাশিত 'স্পেস রিসার্চ অ্যাণ্ড ইউঃ দি এস টি এস -১০৭ রিসার্চ মিশন' দ্রষ্টব্য)।

ঠিক কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল তা এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। শোনা যাচ্ছে অভিযান শুরু হওয়ার সময়ই কিছু একটা বস্তু ছিটকে গিয়ে যানটির তাপনিরোধক টালিতে আঘাত করে। তখন একে গুরুত্ব না দিলেও, এখন অনেকে মনে করছেন যে এই ছোট ঘটনা থেকেই পরপর কিছু ঘটনা ঘটতে ঘটতে শেষপর্যন্ত দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া যানটির জ্বালানিতে বিস্ফোরণ, ২২ বছরের পুরানো যানের কমজোরি হয়ে যাওয়া, ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা, মিটিয়োরয়েড বা উল্কানুর সঙ্গে ধাক্কা, বা নাশকতা — এই ধরনের বিভিন্ন কারণের কথা উল্লেখ করছেন বিশেষজ্ঞরা। যদিও সন্ত্রাসবাদীদের হাত এক্ষেত্রে নেই বলা হয়েছে কারণ অত উচ্চতা ক্ষেপণাস্ত্রের আওতার বাইরে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক যে খবর আজ প্রকাশ্যে এসে পড়েছে, তা হল, খোদ মার্কিন মুলুকের বিশেষজ্ঞরাই অভিযোগ করছেন যে, অনবধানতা বশত ভুলের সম্ভাবনা বাড়ছে, এবং তা বাড়ছে নাসা কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে। তাছাড়া এইসব অভিযানের জন্য বরাদ্দ অর্থ কমছে, ফলে মহাকাশযানগুলির উন্নতিসাধনের কাজ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। কলম্বিয়া মহাকাশযানটি তৈরি হয়েছিল ১৯৮১ সালে, অথচ এটির মত পুরানো যানগুলিকে প্রয়োজনমত উন্নত বা ত্রুটিহীন করা হয়নি।

সংবাদে প্রকাশ, নাসার ও তার মহাকাশযানগুলির নিরাপত্তার দিকে নজর রাখার জন্য শিল্প এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমহলের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত পরামর্শদাতাদের এক প্যানেল থেকে গত বছর নাসা পাঁচ সদস্যকে অপসারিত করে। এর প্রতিক্রিয়ায় আর এক সদস্য নিজেই সরে যান। এঁরা নাসাকে সর্তক করে দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, মহাকাশযান-গুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্রুটি দেখা দিয়েছে। এর জন্য মহাকাশ অভিযান কিছুদিন বন্ধ রাখা প্রয়োজন এবং এই সমস্ত ত্রুটি দূর করতে নাসার জন্য অর্থবরাদ্দ যেখানে বাড়ানো প্রয়োজন, সেখানে তা কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নাসা এই সমালোচনাকে গুরুত্ব দিয়েছে অন্যভাবে — অভিযোগকারীদের হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে। অর্থাৎ দেশের তথা বিশ্বের মানুষের কাছে নাসা কর্তৃপক্ষ তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা তাদের মহাকাশ অভিযানগুলিকে যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখায়, মহাকাশচারীদের শৌর্যবীর্য যেভাবে তুলে ধরে, বাস্তবে তাদের মনোভাব কিন্তু তার উল্টো। সামরিক উদ্দেশ্যপূরণ বা বিশ্বের কাছে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার বাইরে অন্য কোন লক্ষ্য তাদের আছে কি না সন্দেহ। এমনকি দেশ বিদেশের নভশ্চর — যার মধ্যে গবেষণায় ইচ্ছুক বা অভিযানের দুঃসাহসিক ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বিজ্ঞানী বা অন্যরাও থাকেন, তাদের প্রাণের কানাকড়ি মূল্যও আজ আর কর্তৃপক্ষ দিতে প্রস্তুত নয়। তাই একদিকে প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটছে — অপরদিকে গত এক দশকেই দুটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। মনে রাখা ভাল এই ধরনের অভিযান বছর বছর হয় না। বেশ কয়েক বছর প্রস্তুতির পরেই একটা অভিযান করা হয়। তাই দশ বছরে দুটি বড় ধরনের দুর্ঘটনা, নাসার বাজেট বরাদ্দ হ্রাস, মহাকাশযানগুলির ত্রুটি দূর করায় গাফিলতি এবং এ নিয়ে সমালোচনা করায় বিশেষজ্ঞ পরামর্শদাতাদের বিতাড়ন — ঘটনাগুলি নিতান্ত যোগসূত্রহীন না হওয়াই স্বাভাবিক। সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন বাজেট ছাঁটাই এবং গাফিলতিতে মহাকাশযানের মত প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত অভিযানে অসহায়ের মত মৃত্যুবরণ করতে হচ্ছে আজ নভশ্চরদের — শোক জ্ঞাপনের মুহূর্তে আমরা যেন এই কথাটা ভুলে না যাই।

এই অন্যায় অযৌক্তিক যুদ্ধ চালিও না

পাঁচের পাতার পর

যাদের কোন অধিকার আছে বলেই মনে হচ্ছে না। সরকার এক হাজার অভিবাসীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য গোপন জায়গায় অন্তরীণ করে রেখেছে। শত শত মানুষকে নির্বাসিত করা হয়েছে এবং আরও বহু শত আজও জেলে দিন কাটাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার জাপ-আমেরিকানদের জন্য কুখ্যাত বন্দীশিবিরগুলির কথাই আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে। কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথম অভিবাসন আইনে বিশেষ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের আলাদা বেছে নিয়ে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে।

আমাদের স্বার্থরক্ষার কথা বলে, সরকার সমাজের উপর দমনপীড়নের বোঝা নামিয়ে এনেছে। রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র জনগণকে সতর্ক করে বলেছেন — 'ওরা যা বলছে, তা দেখ না।' বিরোধী মতাবলম্বী শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, প্রফেসররা দেখছেন তাঁদের মতামতকে বিকৃত করা হচ্ছে, আক্রমণ করা হচ্ছে এবং দমন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় স্তরে তথাকথিত 'দেশপ্রেমিক আইন' সহ এই ধরনের নানা পদক্ষেপ পুলিশকে অনুসন্ধান ও বাজেয়াপ্ত করার প্রভূত ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছে। এবং এই ক্ষমতা যদি কদাচিৎ বিচারব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে আনাও হয়, তাও করা হয়, গোপনে গোপন আদালতে।

রাষ্ট্রপতি বুশ ঘোষণা করেছেন — "হয় তুমি আমাদের সাথে, নয় আমাদের বিরুদ্ধে।" আমাদের জবাব হল — সমগ্র মার্কিন জনগণের হয়ে কথা বলার অধিকার আপনাকে আমরা দিচ্ছি না। প্রশ্ন করার অধিকার আমরা পরিত্যাগ করব না। নিরাপত্তার শূন্যগর্ভ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আমরা আমাদের বিবেককে বিকিয়ে দেব না। আমরা আবারও বলছি — এসব আমাদের নামে করা চলবে না। এই যুদ্ধের অংশীদার হতে আমরা রাজি নই। এই যুদ্ধ আমাদের ভালোর জন্য করা হচ্ছে — এই ধরনের কোন কথাই আমরা সহ্য করব না। মার্কিন সরকারের এইসব নীতির যারা শিকার দুনিয়াজোড়া সেই নির্যাতিত মানুষের দিকে আমরা আমাদের একটি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি; কথায় ও কাজে আমরা আমাদের সংহতি প্রমাণ করব।

এই বিবৃতিতে আমরা যারা স্বাক্ষর করেছি তারা সমগ্র আমেরিকার মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি — আসুন হাতে হাত ধরে, আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করি। মার্কিন সরকারের নীতির বিরুদ্ধে দুনিয়াজোড়া যে প্রশ্ন ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে আমরা তাকে সহর্ষ করতালিতে অভিনন্দিত করি এবং সাথে সাথে মনে করি এই গণহত্যালীলা বন্ধ করার জন্য আমাদের আরও অনেক অনেক কিছু করতে হবে। ইস্রায়েলের সেই সমস্ত রিজার্ভ সেনাদের কাছ থেকে আমরা প্রেরণা পাই যাঁরা প্যালেস্টাইন জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করে ঘোষণা করেছেন — 'আর নয়, সবকিছুরই একটা সীমা আছে।' আমাদের এদেশেই একদিন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছিল, নির্দেশ অমান্য করে একদিন এদেশের মানুষ ভিয়েতনাম যুদ্ধে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল, অসংখ্য মানুষ এই প্রতিবাদীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের এই সংগ্রামী দৃষ্টান্তগুলি থেকেও আমরা প্রেরণা পাই।

দুনিয়ার মানুষ আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। নীরব থেকে ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়ে আমরা যেন তাঁদের হতাশ না করি। পরিবর্তে, দুনিয়ার মানুষ আমাদের এই শপথ শুনুক — দমন ও যুদ্ধের যন্ত্রকে আমরা প্রতিরোধ করবই এবং অন্যদের সাথে একত্রে একে রুখবার জন্য সম্ভাব্য সমস্ত কিছুই আমরা করব।

(সুসান সারান্ডন ও ৪০ হাজার বিশিষ্ট নাগরিকদের ঘোষণাপত্রটি টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়ার ১ ফেব্রুয়ারি, ০৩ স)খ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।)

জলকর রুখতে সংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলুন

১৫ ফেব্রুয়ারি পুরসভাগুলির সামনে বিক্ষোভ

বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধি ও জলকর নিয়ে ক্ষমতাসীন দলগুলি বড়ই উভয় সংকটে পড়েছে। রাজ্য সরকারের গদিতে আসীন সি পি এম, পুরসভায় ক্ষমতাসীন তৃণমূল, দু-দলের নেতৃত্বই এখন ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোছের পথ খুঁজছে। বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফের নির্দেশ এবং এদেশের একচেটিয়া মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণের প্রবল প্রচারের হাওয়ায় পাল তুলে তারা ভেবেছিল, সহজেই তারা মানুষকে মানিয়ে নিয়ে জলকর বসিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাদ সেধেছে এস ইউ সি আই। ধারাবাহিক আন্দোলনে এবং ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধে জনগণ এস ইউ সি আই-এর পাশে দাঁড়ানোয় এবং সি পি এম-তৃণমূলের নিচের তলার কর্মীদের অনেকেই আন্দোলনের পক্ষে চলে যাওয়ায় দু-দলের নেতৃত্বই প্রবল চাপে পড়ে গিয়েছে।

কংগ্রেস, তথাকথিত উদার অর্থনীতি, অর্থাৎ মালিকদের প্রতি উদার ও জনগণের প্রতি নিষ্ঠুর অর্থনীতি, চালু করার পর থেকেই একচেটিয়া মালিকানাধীন প্রচারমাধ্যমের একটা বড় অংশ নানা যুক্তির আড়ালে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, জল, পরিবহন প্রভৃতি জনপরিষেবা ক্ষেত্রে সবরকম সরকারি সাহায্যকে 'ভরতুকি' আখ্যা দিয়ে সেগুলি তুলে দেবার জন্য সোচ্চারে প্রচার করে চলেছে। তারা কখনো বলছে, "এত ভরতুকি সরকার দেবে কোথা থেকে ?" কখনো বলছে, "ভরতুকির সুফল গরিব মানুষ পাচ্ছে না অথচ এর জন্য টাকা যোগাচ্ছে গ্রামের মানুষ কাজেই তা উঠিয়ে দেওয়া উচিত," তাদের কেউ কেউ এমনও বলছে যে, সরকারের কাছে কম দামে জল বিদ্যুৎ শিক্ষা স্বাস্থ্য চাওয়াটাই যেন অন্যায়, লজ্জাজনক। জনগণের জন্য সরকার ছিটেফোঁটা কিছু দিতে বাধ্য হলে এরা তাকে 'জনমোহিনী', ভোটের জন্য 'নরম নীতি' বলে নিন্দা করছে আর মালিক গোষ্ঠীর স্বার্থে সরকারের অকাতরে টাকা ঢালাকে 'বাস্তবতা' আখ্যা দিয়ে হাততালি দিচ্ছে। এদের মতে সরকারের কর্তব্য হল কর ছাড় দিয়ে, সুদ কমিয়ে, বিদেশি ঋণের টাকায় পথঘাট বানিয়ে দিয়ে পরিকাঠামো গড়ে দিয়ে, সস্তায় জল ও বিদ্যুৎ দিয়ে মালিকশ্রেণীর মুনাফাবৃদ্ধির রাস্তা করে দেওয়া এবং এজন্য তহবিলে যে ঘাটতি হচ্ছে সেই ঘাটতির বোঝাটা জনগণের ওপর চাপানো। এই নীতি এখন সব পরিষদীয় দলই মেনে নিয়েছে। তাই দুঃখের বিষয় বামপন্থী বচনবাগীশ সি পি এম নেতৃত্ব মুখে বিরোধিতা করলেও কার্যত কংগ্রেস প্রবর্তিত এবং বিজেপি অনুসৃত জনপরিষেবা ক্ষেত্রে ভরতুকি তুলে দেওয়া ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতি নিয়েই চলছে। আবার কলকাতা পুরসভায় ক্ষমতাসীন তৃণমূল নেতৃত্ব বাইরে সি পি এম-এর বিরুদ্ধে গরম গরম কথা বললেও বাস্তবে জলকরের প্রশ্নে, জনবসতি হকার, পথের ধারের বাজার উচ্ছেদের প্রশ্নে সি পি এমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল পরিচালিত মালদহ পুরসভা জলকর আদায় করছে শুধু নয়, সুপরিচিত মস্তানদের দিয়ে নির্ধারিত হারের অনেক বেশি কর জবরদস্তি আদায় করছে, যার বিরুদ্ধে আমাদের দল আন্দোলন করছে। নেতৃত্বের এই নির্লজ্জ ভূমিকাকে আড়াল করতে একদিকে মমতা-সুব্রত মতবিরোধের গল্প ছড়াচ্ছে, অন্যদিকে এমন কৌশলে জলকর বসাতে চাইছে যাতে জনসাধারণ ধরতে না পারেন। যদি নিজের দলের মেয়রের জলকর বসানোর সিদ্ধান্ত তৃণমূল নেতৃত্ব অন্যায় মনে করে তবে তাঁকে দল থেকে তারা বহিষ্কার করছে না কেন ?

ইতিমধ্যেই এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে যতটা আন্দোলন হয়েছে, বিশেষ করে ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধে কর, দর, মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনগণের রায় যেমন সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে, তাতে চাপে পড়ে তৃণমূল নেতারা কৌশলী পথ ধরতে চাইছেন। আন্দোলনের চাপে ইতিমধ্যেই তাঁরা গরিব বস্তিবাসীদের রেহাই দেওয়া এবং ন্যূনতম কর ৩০ টাকা থেকে কমিয়ে ১৫ টাকা করবেন ঘোষণা করেছেন। তৃণমূল এখন আরও কৌশলে সরকারি আবাসন, সরকারি অফিস ইত্যাদির ওপর জলকর বসিয়ে এবারের মতো গৃহস্থদের রেহাই দেওয়ার কথা বলছে। অর্থাৎ করের টাকাটা রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আদায় করে জনদরদী সাজতে চাইছে। বলা বাহুল্য, এসবই কৌশলের প্যাঁচ পয়জার। নীতিগত যে প্রশ্নে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল একমত — তা হল, জল সরকার বিনামূল্যে দেবে না, কর সকলকেই দিতে হবে। কখন কার ওপর কতটা কর চাপানো হবে, কাকে কতটুকু বা কতদিন ছাড় দেওয়া হবে — এনিয়ে ভোটের অঙ্ক কষে কিছু মতপার্থক্য এদের মধ্যে আছে কিন্তু মূল জায়গায় সকলেই একমত। কারণ দেশী-বিদেশী একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে আর্থিক সংস্কার করতে এরা মালিকশ্রেণীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এস ইউ সি আই-এর রাজনীতি এদের সকলের বিপরীত। আমাদের দল জনস্বার্থ রক্ষার জন্য শপথবদ্ধ। ভোটের লক্ষ্যে নয়, জনতার সংগঠিত শক্তির জন্ম দিয়ে শোষণমুক্তির বিপ্লবী সংগ্রাম গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণআন্দোলন পরিচালনা করা আমাদের কর্মসূচি। মালিকগোষ্ঠীর মুনাফাবৃদ্ধির স্বার্থে সরকার পরিচালনাকে আমরা বাস্তবতা বলি না। কোটি কোটি মানুষের বাঁচার দাবিই আমাদের কাছে বাস্তব। কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা সরকারের দায়িত্ব। প্রতিটি মানুষের জীবনের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ সরকারকে দিতে হবে — এই ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবি। সকলের জন্য খাদ্য, পানীয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করার কাজটি সরকারের কাছে অগ্রাধিকার পাবে, এসব ক্ষেত্রে সরকারি তহবিলের টাকা সবচেয়ে বেশি খরচ করা হবে — এটিই গণতান্ত্রিক নীতি। জলকর বসানো এই নীতির ঠিক বিপরীত — তাই তা জনবিরোধী, অগণতান্ত্রিক। ইতিমধ্যেই শহরাঞ্চলে পানীয় জলের একটা বিরাট বাজার বোতলবন্দী জল বিক্রির কোম্পানিগুলির হাতে চলে গিয়েছে, সারা ভারতে এর পরিমাণ বার্ষিক হাজার কোটি টাকা। তার উপর জলকর বসানোর আঘাত শুধু শহর বা পুর এলাকাগুলির উপরেই আসবে তা নয়। নাগরিকদের বিনামূল্যে জল দেবার দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলার সুযোগ যদি একবার স্বীকৃত হয়ে যায় তবে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে নলকূপ বসানো বা জলাশয় সংস্কারের কাজও তারা বন্ধ করে দেবে। কাজেই জলকর বসানো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত জনপরিষেবায় সরকারি ব্যয় ক্রমশ তুলে দেওয়ার সামগ্রিক আক্রমণের তা অংশ। একে যেমন তেমন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রোখা যাবে না। এজন্য চাই সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন, চাই জনগণের নিজস্ব উদ্যোগ, চাই সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্ব। আন্দোলনকে সেইভাবে গড়ে তোলার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

ত্রিপুরার নির্বাচনে এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়ী করুন

আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি ৬০ সদস্যবিশিষ্ট ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনে গণ-আন্দোলনকে শক্তিশালী করা, বিধানসভার অভ্যন্তরে গণআন্দোলনের কণ্ঠস্বরকে পৌঁছে দেওয়ার মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী নীতির ভিত্তিতে চারটি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে, এস ইউ সি আই ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি বামপন্থা থেকে বিচ্যুত সি পি আই এম, পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষক কংগ্রেস, বিজেপি ও উগ্র-উপজাতীয়তাবাদীদের পরাস্ত করার আহ্বান জানিয়ে বলেছে — নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস বা সিপিএম যে জোটই ক্ষমতায় আসুক, মালিকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য তারা জনগণের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনবে। তাই কারা সরকার গঠন করবে, এ প্রশ্ন জনগণের বিচার্য নয়, তাঁদের ভাবতে হবে সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে কোন্ দল লড়বে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের উন্নত আদর্শের বনিয়াদের উপর এস ইউ সি আই ধারাবাহিকভাবে যে আন্দোলন চালাচ্ছে তাকে আরও শক্তিশালী করতে, হরেক রঙের মালিকি রাজনীতির বিপরীতে মেহনতি মানুষের সংগ্রামী রাজনীতির পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে গণআন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিক এস ইউ সি আই প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এস ইউ সি আই প্রার্থী তালিকা

কেন্দ্র	প্রার্থী
৬নং আগরতলা	কমরেড শিবানী ভৌমিক
১৪নং বাধাঘাট	কমরেড সুব্রত চক্রবর্তী
৫৬নং ধর্মনগর	কমরেড সঞ্জয় চৌধুরী
৩২ নং রাধাকিশোরপুর	কমরেড শেফালি চৌধুরী

ভারত বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান আলোচনার ভিত্তিতেই করতে হবে

এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ৫ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের বিরোধকে কেন্দ্র করে কিছুকাল যাবত উত্তেজনা দানা বাঁধছিল। তদুপরি উভয়দেশের শাসকশ্রেণীগুলি ও শাসক দলগুলিরও প্রয়োজন সীমান্ত উত্তেজনা, সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা যাতে জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে জনমনকে বিভ্রান্ত করা যায়, জনগণের ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় এবং এভাবে গণআন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যায়। বিস্ময়ের কিছু নেই যে বাংলাদেশের শাসক দল বি এন পি তার সহযোগী জামাত, এমন কি আওয়ামী লীগ-ও তাদের এই ঘৃণ্য পরিকল্পনায় সাথী রূপে ভারতের বিজেপি ও সংঘ পরিবার, কংগ্রেস এবং অন্যান্য বুর্জোয়া দলগুলি, এমনকি সি পি আই (এম)-কেও পেয়েছে।

বাংলাদেশী নাগরিকদের স্বদেশে ফেরৎ পাঠানোকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, তাকেও উপরোক্ত ঘৃণ্য স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ সহ ২১৩ জন মানুষকে সীমান্ত এলাকার 'নোম্যানস ল্যাণ্ডে' ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উভয় দেশই তাদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করছে।

আমরা দাবি করছি অবিলম্বে ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারকে পারস্পরিক বৈঠক করে আন্তর্জাতিক নীতি ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।

উভয় দেশের জনগণের কাছে আমাদের আবেদন দুই দেশের সরকারের এই বিপজ্জনক চক্রান্ত সম্পর্কে যেন তাঁরা সতর্ক থাকেন এবং নজরদারি রাখেন।"

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

৭ ফেব্রুয়ারি প্রতীক ধর্মঘটে

চটকল শ্রমিকদের ব্যাপক সাড়া

চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চটকল শ্রমিকরা ১ দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করে। রাজ্যের ৫৯টি বেসরকারি চটকলের মধ্যে ৫৩টিতেই ধর্মঘট হয়েছে সর্বাত্মক, বাকিগুলিতে আংশিক।

মালিকদের বেপরোয়া কার্যকলাপে রাজ্যের চটকল শ্রমিকরা নিদারুণ বঞ্চনার শিকার। 'চটশিল্পের সংকটে'র ধুয়ো তুলে মালিকদের যথেচ্ছাচারকে মদত দিয়ে চলেছে রাজ্য সরকার। গত ৪ বছর ধরে শ্রমিকদের বোনাস দেওয়া হচ্ছে না, গত ১ বছর ধরে ডি.এ.-ও পাচ্ছেনা তারা। এর সাথে গত বছর এক কালা চুক্তি করে মজুরিকে উৎপাদনের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, যার সুবিধা মালিকরা লুটছে। একারণেই ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয়নি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, বি এম এস, এ আই সি সি টি ইউ, এন এফ আই টি ইউ। এরা গত বছর থেকেই ঐ কালা চুক্তির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৭ ফেব্রুয়ারি এই চারটি সংগঠন যৌথভাবে রাজ্যের চটকলগুলিতে ১ দিনের প্রতীক ধর্মঘটের ডাক দেয়। সিটু, আই এন টি ইউ সি, তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন এই ধর্মঘটের বিরুদ্ধতা করেছে, শ্রমিকদের মধ্যে বিরুদ্ধ প্রচারও চালিয়েছে। তবুও আন্দোলনমুখী শ্রমিকরা ধর্মঘটে ব্যাপক সাড়া দিয়েছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র রাজ্য সহ-সম্পাদক ও বেঙ্গল জুট মিলস্ ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই আন্দোলন চলবে যতদিন না সরকার মালিকদের স্বার্থরক্ষার পথ ছেড়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি গ্রহণ করছে।

৭ ফেব্রুয়ারি হুগলি জুট মিলের গেটে ধর্মঘটরত শ্রমিকরা

তমলুকে পুলিশের লাঠিচার্জ, আহত ২০

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক থানার চাঠরা মাতঙ্গিনী ব্লক অফিস থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরে মাঠে ৩ ফেব্রুয়ারি ৩০-৩২ বছর বয়সের মহিলার মাথাহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় স্থানীয় মানুষ। ঐ বিশেষ জায়গায় গত কয়েক বছরের মধ্যে দুজন পুরুষ ও তিনজন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ফলে ঐদিন আবার বীভৎস খুনের ঘটনায় বিক্ষুব্ধ মানুষ দলে দলে এসে পথ অবরোধ করেন। তমলুকের সি আই, ও সি বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে এসেই বিনা প্ররোচনায় অবরোধকারী জনতার উপর বেপরোয়া লাঠি চার্জ করে। লাঠি ও বন্দুকের বাঁটের আঘাতে এস ইউ সি আই কর্মীরা সহ ২০ জন আহত হন। কমরেড সুদর্শন সামন্তকে সঙ্কটজনক অবস্থায় তমলুক হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। পুলিশ ২ জন এস ইউ সি আই কর্মী সহ ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে।

এই বর্বরোচিত লাঠিচার্জের প্রতিবাদে ৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক ও সন্তোষ মাইতি।

২ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মার্কিন কনস্যুলেটের সামনে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্রের একটি কুশপুতুলে অগ্নিসংযোগ করা হচ্ছে।

(আরও ছবি ও সংবাদ পাঁচের পাতায়)

ধানতলার ঘটনা বীভৎস
এস ইউ সি আই-এর বিবৃতি

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৮ জানুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"নদীয়ার ধানতলায় স্থানীয় সি পি এম নেতাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফলে সংগঠিত ডাকাতি, খুন ও নারী নির্যাতনের বীভৎস ঘটনা রাজ্যবাসীকে শিহরিত ও উদ্বিগ্ন করেছে।

এই মর্মান্তিক ঘটনা পুনরায় দেখিয়ে দিচ্ছে, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা ও নারীর নিরাপত্তা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং আদর্শবর্জিত গদিসর্বস্ব পেশী নির্ভর রাজনীতিতে নিমজ্জিত হয়ে সি পি এম-এরও কী করুণ পরিণতি হয়েছে।

আমরা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের প্রতিটি থানায় বিক্ষোভ সংগঠিত করে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহবান জানাচ্ছি।

আমরা দাবি করছি —

১। সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। নিহত ড্রাইভারের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে,

৩। দলীয় রং না দেখে সর্বত্র সমাজবিরোধী দমনে পুলিশকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে,

৪। পুলিশ প্রশাসনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে।"

চা-শ্রমিকদের সঠিক নেতৃত্ব চিনতে হবে

চারের পাতার পর

পীড়াপীড়ি করছেন। তারা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের রাস্তায় নেই, ব্যস্ত আছেন আপসের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে, যেখানে শ্রমিকদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া হচ্ছে।

আন্দোলনই বাঁচার একমাত্র রাস্তা

চা-শ্রমিকদের এই সঙ্কট মুহূর্তে আন্দোলনই তাই বাঁচার একমাত্র রাস্তা। চা-শ্রমিকরা একের পর এক অধিকার হারাচ্ছেন, ছাঁটাই হচ্ছেন, মজুরি কমছে, মজুরির অঙ্গীভূত সুযোগ-সুবিধাগুলি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অর্ধবেতনে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, মজুরি থেকে কেটে নেওয়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মালিক আত্মসাৎ করছে, পুলিশ-প্রশাসন-সরকার মালিকদের শত অপরাধেও ব্যবস্থা নিতে রাজি হচ্ছে না, এই রকমভাবে সর্বাত্মক আক্রমণ হচ্ছে। এই আক্রমণের সামনে বড় বড় ও নামী ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের স্বার্থে কাজ করছে না। একমাত্র ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) অনুমোদিত 'এন-বি-টি-পি-ইউ সাধ্যমত বিক্ষোভ, অবস্থান, মিছিল সংগঠিত করছে, যার প্রচার দৈনিক পত্রিকাতে আসছে না। গত ২৭ জানুয়ারি এস ইউ সি আই-এর ডাকা বাংলা বন্‌ধের অন্যতম দাবি ছিল বন্ধ কলকারখানা ও চা-বাগান খুলতে হবে। ইউ টি ইউ সি (লেনিন সরণী) এই বন্‌ধকে সমর্থন করে। চা-শ্রমিকরা এই বন্‌ধে সাড়াও দিয়েছেন। ইতিমধ্যে ২/১টি করে বাগান খোলা শুরু হয়েছে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার নানা শর্ত মেনে। নামীদামী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আপসমুখী মনোভাবের জন্যই শ্রমিকরা কোথাও কোথাও কাজে যোগ দিতে বাধ্য হলেও মালিক-সরকার-শ্রমিক নেতাদের এই ফয়সালা তারা খুশি মনে মেনে নিচ্ছেন না। এই অবস্থায় তাদের বুঝতে হবে কারা তাদের প্রকৃত মিত্র। একথা ঠিক, সঙ্কটের মুহূর্তে, নানা অপপ্রচার সত্ত্বেও, তারা ইতিমধ্যে বুঝতে পেরেছেন সঠিক নেতৃত্ব ছাড়া বড় বড় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুললেও তার আসল শক্তি কিছু থাকে না। সংগ্রামের মুহূর্তে সেইসব নামী ইউনিয়ন নেতাদের সাহায্য পাওয়া যায় না। এমনকি এক নামী ইউনিয়ন পাল্টে আর একটা নামী ইউনিয়ন এনে হাতবদলেও লাভ হয় না। এই পরিস্থিতিতে বাঁচতে হলে তাদের সঠিক সংগ্রামী নেতৃত্বকে চিনে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে আজ যে মেরুকরণ হয়েছে তাতে একদিকে রয়েছে এস ইউ সি আই এবং জনগণের সংগ্রামী জোট, আর অন্যদিকে রয়েছে সি পি এম-আর এস পি-কংগ্রেস-তৃণমূল প্রভৃতির আপসকামী জোট। এস ইউ সি আই, সকল আক্রমণ মোকাবিলা করে জনগণকে নিয়ে একক উদ্যোগে লাগাতার আন্দোলন পরিচালনা করে প্রাথমিকে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছে। অন্যান্য দাবিতে লড়াই করে আংশিকভাবে কিছু কিছু দাবি আদায়ও করেছে। শ্রমিকরা এই শক্তিকে শক্তিশালী করলেই দাবি আদায়ে জোরদার লড়াই হতে পারে। তাই বর্তমান সঙ্কটের মুহূর্তে এস ইউ সি আই পরিচালিত জনগণের সংগ্রামী জোট এবং চা-শ্রমিকদের সংগ্রামী সংগঠন 'এন-বি-টি-পি-ই-ইউ - কে শ্রমিকদের শক্তিশালী করতে হবে।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net